# সংস্কৃত ব্যাকরণে পাণিনীয় সংস্করণ

**প্রমথ মিস্ত্রী***

**Abastract:** The structure of every language on grammar. For this, grammer is called the constitution of language. While the constitution contains the laws and regulations of a country, the grammar contains the laws and regulations of the language. Grammer identifies the rules of varios elements of language (sandhi, prefixes, suffixes, case, samās etc). The Paninian version of Sanskrit grammar has the same function. Here Panini has simultaneously highlighted the constitution and the grammar both of the Vedic and Sanskrit languages. Our topic is the Paninian version of Sanskrit grammar. However, from this edition, not only the grammar of the Sanskrit language but also the grammar of Bengla, Hindi, Prakrit and so on. are known. The Bengala language is one of them. For these reasons the Paninian version is given the status of proper "Vedāṅga" grammar in Sanskrit grammare. Even today, many scholars consider the Paninian grammar (Aṣṭādhyāẏī) to be a "wonder of the human brain". So, the main objective of the present stady is to show how we can easily know Sanskrit grammar through the Paninian version of Sanskrit grammar.

## প্রারম্ভিকা

পৃথিবীর প্রাচীন ভাষাবংশসমূহের অন্যতম ভাষাবংশ হলো ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ। এই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের আবার অন্যতম প্রাচীন শাখা হচ্ছে ইন্দো-ইরানীয় শাখা। এই ইন্দো-ইরানীয় শাখার অন্যতম প্রাচীন শাখা 'প্রাচীন ভারতীয় আর্য'। এই শাখা থেকেই বৈদিক ভাষা এসেছে। ভাষাবিদ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মতে প্রাচীন ভারতীয় আর্যযুগ ১২০০ থেকে ৮০০ খ্রিষ্টপূর্ব। আর ভাষাবিদ ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে ভারতে আর্য আগমনের সময় আনুমানিক ১৫০০ খ্রিষ্টপূব এবং বেদ সংগ্রহের সময় ১০০০ খ্রিষ্টপূর্ব (শহীদুল্লাহ্, ১৯৯৯ : ২১)। উক্ত শাখার 'কথ্যরূপ' থেকে 'সংস্কৃত ভাষা'র জন্ম। অর্থাৎ সংস্কৃত হলো বৈদিক যুগের অন্তে কথ্য ভাষা হতে আবির্ভূত লেখ্য ভাষা। উল্লেখ্য একসময় 'প্রাচীন ভারতীয় আর্য' তথা 'বৈদিক ভাষা' ব্যাকরণগ্রন্থের অভাবে হারিয়ে যেতে বসেছিল। তাই বৈদিক ভাষা তথা বৈদিক ব্যাকরণ রক্ষার্থে একে সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দেয়। পাণিনি, কাত্যায়ন, পতঞ্জলি প্রমুখ বৈয়াকরণের হাতে বৈদিক ভাষা তথা বৈদিক ব্যাকরণ সংস্কারকৃত হয়। সর্বজনবিদিত যে সংস্কৃত ভাষা বৈদিক ভাষারই রূপভেদমাত্র। অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষা বৈদিক ভাষার পরিমার্জিত রূপ। 'প্রাচীন ভারতীয় আর্য' তথা 'বৈদিক ভাষার' কতদিন পরে প্রথম 'সংস্কৃত ভাষা' চালু হয়েছিল, তা ঠিকভাবে বলা কঠিন। 'প্রাচীন ভারতীয় আর্য' ভাষার দুটি রূপ: এক. বৈদিক (সাহিত্যিক বা সাধু ভাষা; নিদর্শন: ঋগ্বেদের ও পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যের ভাষা) এবং দুই. লৌকিক (নবীনতর; নিদর্শন: রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও বিভিন্ন লৌকিক আখ্যান-উপাখ্যানসহ তৎকালীন শিক্ষিত ব্যক্তির দৈনন্দিন ব্যবহারের ভাষা)। এই শেষোক্ত ভাষার পাণিনি অনুশাসিত রূপই আমাদের পরিচিত 'সংস্কৃত ভাষা'। বিভিন্ন মনীষী বিভিন্নভাবে বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষার সংজ্ঞার্থ দিয়েছেন। সুকুমার সেন তাঁর *ভাষার ইতিবৃত্ত* গ্রন্থে বৈদিক ভাষা সম্পর্কে বলেছেন, 'বৈদিক (অর্থাৎ ঋগ্বেদের) ভাষাই হইতেছে

* সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ভারতীয়-আর্য ভাষার প্রাচীনতম সাহিত্যিক রূপ অর্থাৎ প্রথম সাধু ভাষা' (সেন, ২০১৫ : ৮৪)। অন্যভাবে বলা যায় প্রাচীনকালে আর্যরা তাঁদের চিন্তাভাবনা যে ভাষায় ব্যক্ত করে *ঋগ্বেদ*, *সামবেদ*, *যজুর্বেদ* প্রভৃতি সাহিত্য রচনা করেছেন, এককথায় সে ভাষাকেই 'বৈদিক ভাষা' বলে। আবার সুকুমার সেন সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কে বলেন, 'সংস্কৃত হইল বৈদিক যুগের অন্তে কথ্য ভাষা হইতে লেখ্য ভাষায় প্রত্যাবর্তন। স্বভাবতই এ প্রত্যাবর্তন অন্ত্য বৈদিক স্তরের শেষ রচনা উপনিষদের ভাষার কাছাকাছি পৌঁছিয়াছে। মোট কথা এই যে সেকালে "সংস্কৃত" বলিয়া, বৈদিক হইতে ভিন্নতর ভাষা বুঝাইত না। বৈদিক ভাষাও সংস্কৃতের আওতার বাহিরে ছিল না' (সেন, ২০১৫ : ৮৭)। বৈদিক ভাষার ঋক্ মন্ত্রসমূহ কবে প্রথম দৃষ্ট বা রচিত হয় এবং তার কতদিন পরে প্রথম লিপিবদ্ধ হয়, তা সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। তাই বেদের অর্থাৎ বৈদিক ভাষার কাল নির্ণয়ে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন।

প্রাচ্য পণ্ডিতদের মতে:

এক. বালগঙ্গাধর তিলকের মতে খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০০ শতক ঋগ্বেদের আবির্ভাবকাল (ভট্টাচার্য, ১৯৯৬ : ৮)।

দুই. ভাষাবিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে ভারতে আর্য আগমনের সময় আনুমানিক ১৫০০ খ্রিষ্টপূর্ব এবং বেদ সংগ্রহের সময় ১০০০ খ্রিষ্টপূর্ব (শহীদুল্লাহ্, ১৯৯৯ : ২১)। তিনি তাঁর *The Origin and Development of the Bengali Language* গ্রন্থে বলেছেন প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার (বৈদিক উপভাষাসমূহ) আনুমনিক কাল ১২০০ খ্রিষ্টপূর্ব (Chatterji, 1986 : 1053)।

তিন. ভাষাবিদ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তাঁর *বাঙ্গালা ভাষা ইতিবৃত্ত* গ্রন্থে সুনীতির মত গ্রহণীয় মনে করেন (অর্থাৎ আর্যভাষার আনুমনিক কাল ১২০০ খ্রিষ্টপূর্ব)। তবে তাঁর মতে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার কাল ১২০০ – ৮০০ খ্রিষ্টপূর্ব (শহীদুল্লাহ্, ১৯৯৯ : ২১)।

চার. সুকুমার সেন তাঁর *ভাষার ইতিবৃত্ত* গ্রন্থে বলেছেন যে 'ঋগ্বেদের মধ্যে আর্যদের প্রাচীনতম সাহিত্যরচনা সংকলিত আছে। ঋগ্বেদের সর্বাপেক্ষা পুরানো কবিতাগুলির রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব ১২০০ অব্দের কাছাকাছি বলিয়া অনুমান করা হয়'। তিনি আরও বলেন, 'ঋগ্বেদের কবিতাগুলি যত পুরানো, ঋগ্বেদ-সংহিতার অর্থাৎ গ্রন্থাকারে সংকলনের কাল তত প্রাচীন নয়। সম্ভবত ১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে বেদের কবিতা বা সূক্তগুলি 'বেদ' রূপে সংকলিত হইয়াছিল (সেন, ২০১৫ : ৮৪ – ৮৫)।

পাঁচ. ভাষাতাত্ত্বিকগণের মতে বৈদিক সাহিত্যের রচনাকাল ২০০০ – ১৫০০ খ্রিষ্টপূর্ব (বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০০৫ : ৫২)।

ছয়. শ্রীপরেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর *সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ* গ্রন্থে বলেছেন যে প্রাচীন বৈদিক যুগের প্রাচীনতম রচনা হলো ঋগ্বেদ সংহিতা। এর সংকলনের সময়সীমা আনুমানিক ১২০০ – ১০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ। আর অর্বাচীন বৈদিক যুগের রচনা ঋগ্বেদের দশম মণ্ডল, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ সংহিতা। এগুলো সংকলনের সময়সীমা আনুমানিক ১০০০ – ৮০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ (মজুমদার, ২০০০ : ৫৬)।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে:

এক. জার্মান পণ্ডিত ম্যাক্সমুলার বলেছেন, খ্রিষ্টপূর্ব ১০০০ শতকের পূর্বেই *ঋগ্বেদ* রচনা সম্পূর্ণ হয়েছিল (ভট্টাচার্য, ১৯৯৬ : ৮)।

দুই. জার্মান মনীষী জ্যাকোবির মতে প্রাচীন সংহিতার রচনাকাল খ্রিষ্টপূর্ব ৪৫০০ শতক (ভট্টাচার্য, ১৯৯৬ : ঐ)।

তিন. উইন্টারনিজ বলেছেন, খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০ বা ২৫০০ বৎসর পূর্বে বেদ প্রথম রচিত হয় এবং খ্রিষ্টপূর্ব ৭৫০ – ৫০০ বৎসরে বৈদিক সাহিত্যের স্তর সম্পূর্ণ হয়ে যায় (ভট্টাচার্য, ১৯৯৬ : ঐ)।

চার. ম্যাকডোনেল ম্যাক্সমুলারের মত স্বীকার করেন অর্থাৎ খ্রিষ্টপূর্ব ১০০০ শতকের পূর্বেই *ঋগ্বেদ* রচনা সম্পূর্ণ হয়েছিল। তবে তাঁর মতে বেদের প্রাচীনতম অংশের কাল খ্রিষ্টপূর্ব ১৩০০ শতক (বেগম, ১৯৯৬ : ১৭)।

পাঁচ. কীথের মতে ঋগ্বেদের প্রাচীন অংশের রচনাকাল খ্রিষ্টপূর্ব ১২০০ শতক (বেগম, ১৯৯৬ : ঐ)।

পূর্বেই উক্ত হয়েছে – প্রাচীন ভারতীয় আর্যদের নিকট সম্পর্কযুক্ত উপভাষাগুলোর এক সাহিত্যিক রূপ সাধুভাষা অর্থাৎ বৈদিক ভাষা। তাই এ ভাষার দৃষ্টান্ত খুঁজতে হলে আমাদের বেদ তথা বৈদিক সাহিত্যের দিকে তাকাতে হয়। আর্যরা এ ভাষায় দেবতাদের উদ্দেশে স্তব রচনা করেছেন। ভাষ্যকার পতঞ্জলি ঋগ্বেদের নিম্নোক্ত মন্ত্রদ্বয়ের মাধ্যমে সংস্কৃত ব্যাকরণের স্বরূপ উদ্ঘাটন ও প্রশংসা করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ:

এক. চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়ো অস্য পাদাঃ
দ্বে শীর্ষে সপ্ত হস্তাসো অস্য।
ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো রোরবীতি
মহো দেবো মর্ত্যাঁ আবিবেশ (দত্ত, ২০০০ : ৩৩৩) ॥

*ঋগ্বেদ সংহিতা* ৪/৫৮/৩

[বাংলা অনুবাদ : ব্যাকরণস্বরূপ কামবর্ষণকারী বৃষভের চারটি শৃঙ্গ অর্থাৎ নাম (প্রাতিপদিক), আখ্যাত (ক্রিয়া), উপসর্গ ও নিপাত (অব্যয়); তিনটি পাদ অর্থাৎ ভূত (অতীত), ভবিষ্যৎ ও বর্তমান; দুটি মস্তক (নিত্য ও কার্য্য) এবং সাতটি হস্ত (প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া প্রভৃতি সাতটি বিভক্তি)। ইনি অভিষ্টবর্ষী, ইনি তিন প্রকারে বদ্ধ (বক্ষে, কণ্ঠে ও মস্তকে) হয়ে উচ্চস্বরে বার বার শব্দ করছেন। ইনি মহাদেব অর্থাৎ শব্দব্রহ্ম। ইনি মনুষ্যগণের মধ্যে প্রবেশ করেছেন, সমস্ত জীবগণ তাঁর থেকে অভিন্ন হলেও মনুষ্যগণের মধ্যে বিশেষভাবে প্রকট হয়েছেন।]

দুই. সক্তুমিব তিতউনা পুনন্তো
যত্র ধীরা মনসা বাচমক্রত।
অত্রা সখায়ঃ সখ্যানি জানতে
ভদ্রৈষাং লক্ষ্মীর্নিহিতাধিবাচি (দত্ত, ২০০০ : ৫৩৯) ॥

*ঋগ্বেদ সংহিতা* ১০/৭১/২

[বাংলা অনুবাদ : চালনির দ্বারা শস্যকে যেমন পরিষ্কার করা হয়, তেমনি বুদ্ধিমানগণ ব্যাকরণের দ্বারা বুদ্ধিবলে পরিষ্কৃত ভাষা প্রস্তুত করেন। সে ভাষাতে বন্ধুগণ বন্ধুত্ব স্বীকার করেন। এঁদের বাণীতে মঙ্গলময়ী লক্ষ্মী বিশেষভাবে বিরাজ করেন।]

উক্ত ঋগ্বেদের দৃষ্টান্ত দুটি থেকে আমরা বলতে পারি ভারতীয় আর্যরা সাহিত্যিকরূপে যে ভাষা ব্যবহার করতেন তাই বৈদিক ভাষা। যেহেতু সংস্কৃত ভাষা বৈদিক ভাষা হতে ভিন্নতর কোনো ভাষা নয়, সেহেতু

বৈদিক ভাষার রচনা কালই সংস্কৃত ভাষার রচনা কাল ধরে নেওয়া যায়। এ ভাষার দৃষ্টান্ত খুঁজতে হলে আমাদের বেদপরবর্তী লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্যের দিকে তাকাতে হয়। মহাকবি কালিদাস তাঁর *কুমারসম্ভব* কাব্যে সংস্কৃত ভাষার কথা বলেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ :

এক. দ্বিধা প্রযুক্তেন চ বাঙ্ময়েন সরস্বতী তদ্মিথুনং নুনাব।
সংস্কারপুতেন বরং বরেণ্যং মুখগ্রাহ্য-নিবন্ধনেন (সেন, ২০১১ : ৩১৫/২৫৮) ॥
কালিদাস *কুমারসম্ভব* (শ্লোক – ৭/৯০)

[বাংলা অনুবাদ : সরস্বতী সেই দম্পতির (শিব ও উমা বা পার্বতী) স্তব করলেন দ্বিবিধ শব্দগঠিত ভাষায় – বরেণ্য বর শিবকে সংস্কারপূত সংস্কৃত ভাষায়, উমাকে শ্রুতিমধুর প্রাকৃতে।]

সুতরাং আমরা বলতে পারি যে বৈদিক ভাষার সংস্কারকৃত বা পরিশীলিত রূপ হচ্ছে সংস্কৃত ভাষা। উল্লেখ্য পাণিনি বৈদিক ও সংস্কৃত উভয় ভাষার ওপরই তাঁর বিখ্যাত ব্যাকরণগ্রন্থ *অষ্টাধ্যায়ী* রচনা করেন। আলোচ্য প্রবন্ধে শুধু সংস্কৃত ব্যাকরণে পাণিনীয় সংস্করণের পরিচয় ব্যক্ত করা হয়েছে। একইসাথে এর মাধ্যমে বাংলা ভাষার ব্যাকরণেরও অনেক তথ্য জানানো হয়েছে। এ বিষয়টি এক্ষেত্রে উপস্থাপনের প্রযত্ন নেওয়া হয়েছে।

**সংস্কৃত ব্যাকরণে পাণিনীয় সংস্করণ**

পাণিনি সংস্কৃত ভাষা তথা ব্যাকরণশাস্ত্রের মধ্যমণি। তাঁর আবির্ভাবকাল নিয়ে অনেক মতভেদ লক্ষ করা যায়। তিনি খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে শুরু করে খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টম কিংবা তারও বহু পূর্বে আবির্ভূত হয়েছিলেন বলে বিভিন্ন পণ্ডিত মত প্রকাশ করেছেন (চক্রবর্তী, ২০০৩ : ৩)। কথিত আছে তিনি শিবের (মহেশ্বর) কাছ থেকে চতুর্দশ সূত্র লাভ করেন (বিদ্যাসাগর, ১৯৯৯ : ১)। দৃষ্টান্তস্বরূপ :

| | |
|---|---|
| এক. অ ই উ ণ্ | আট. ঝ ভ ঞ্ |
| দুই. ঋ ৯ ক্ | নয়. ঘ ঢ ধ ষ্ |
| তিন. এ ও ঙ্ | দশ. জ ব গ ড দ শ্ [ব = বর্গীয় ব, পেট কর্তন নয়] |
| চার. ঐ ঔ চ্ পেট কর্তন নয়] | এগারো. খ ফ ছ ঠ থ চ ট ত ব্ [ব = অন্তঃস্থ ব, |
| পাঁচ, হ য ব র ট্ | বারো. ক প য়্ |
| ছয়. ল ণ্ | তেরো. শ ষ স র্ |
| সাত. ঞ ম ঙ ণ ন ম্ | চৌদ্দ. হ ল্ |

উল্লেখ্য বাংলা ভাষায় বর্গীয় ব এবং অন্তঃস্থ ব-এর আকৃতিতে কোনো পার্থক্য নেই বিধায় বর্ণতালিকা থেকে অন্তঃস্থ ব-কে বাদ দেওয়া হয়েছে। উক্ত চৌদ্দটি মাহেশ্বর সূত্র অবলম্বন করে পাণিনি তাঁর *শব্দানুশাসন* বা *অষ্টাধ্যায়ী* [অষ্টানাম্ অধ্যায়ানাং সমাহারঃ = অষ্ট-অধ্যায় + স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ = 'অষ্টাধ্যায়ী] রচনা করেন। তাই বর্ণোপদেশক মাহেশ্বর সূত্রগুলো পাণিনি ব্যাকরণের চাবিকাঠি। আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত হওয়ার কারণে এই নাম। প্রতিটি অধ্যায় আবার চারটি পাদে বিভক্ত। অর্থাৎ এতে মোট ৮ × ৪ = ৩২ টি পাদ আছে। সমগ্র গ্রন্থটি সূত্রাকারে নিবন্ধ। সূত্রগুলো বিভিন্ন সংখ্যায় এবং অধিকাংশ স্থলেই একাধিক বিষয়ে সন্নিবেশিত আছে। তাই পাণিনীয় সংস্করণ বলতে আমরা এই *অষ্টাধ্যায়ী* গ্রন্থকে বুঝি। পাণিনীয় ব্যাকরণের সূত্রগুলোর পরে তিন ভাগে যে সংখ্যা লেখা হয় তার প্রথমটি অধ্যায়, দ্বিতীয়টি পাদ এবং তৃতীয়টি সূত্রসংখ্যা নির্দেশ করে। যেমন ১/১/২ = প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের দ্বিতীয় সূত্র, ৭/১/১ = সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম পাদের প্রথম সূত্র। এরূপ সর্বত্র। *অষ্টাধ্যায়ী*-র সর্বপ্রথম সূত্র 'বৃদ্ধিরাদৈচ্'

(১/১/১) এবং সর্বশেষ সূত্র 'অ অ' (৮/৪/৬৮)। পাণিনির সূত্র সংখ্যা নিয়ে মতভেদ আছে। পাণিনি তাঁর *অষ্টাধ্যায়ী*-তে ৩৯৮৩টি সূত্রে ব্যাকরণের নিয়মাবলি প্রদান করেছেন। মতান্তরে শ্রীশচন্দ্র বসুর মতে সূত্রসংখ্যা ৩৯৯৬, কাশিকার মতে ৩৯৮১ এবং ভট্টোজিদীক্ষিতের মতে ৩৯৭৬ (কবিরাজ, ২০০৫ : ১৪)। একারণে কেউ কেউ সূত্রের সংখ্যা প্রায় ৪০০০ বলেছেন। উল্লেখ্য পাণিনির হাতের স্পর্শেই সংস্কৃত ভাষা তার পূর্ণতা লাভ করে। পূর্বে উক্ত হয়েছে সংস্কৃত ভাষা হচ্ছে বৈদিক ভাষার সংস্কারকৃত বা পরিশীলিত রূপ। বৈদিক ভাষায় ছিল একই শব্দের একাধিক বিকল্প রূপ। এ ভাষা চর্চায় অর্থাৎ পঠন-পাঠনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা ছিল। এমনকি এ ভাষার কোনো ব্যাকরণ আজও আমাদের হস্তগত হয়নি। তাই বৈদিক ভাষা অধ্যয়নে পদে পদে ছিল নানা সমস্যা। এ ভাষা ছিল বিক্ষিপ্ত, স্বচ্ছন্দচারী একটি ভাষাস্রোত। এ ভাষায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত একাধিক বিকল্পরূপের [বৈদিক শব্দরূপের ক্ষেত্রে অ-কারান্ত 'নর' শব্দের প্রথমার দ্বিবচন, বহুবচন, দ্বিতীয়ার দ্বিবচন, তৃতীয়ার একবচন, বহুবচন, ষষ্ঠীর বহুবচন, সম্বোধনের বহুবচনে একাধিক রূপের (নরৌ/নরা, নরাঃ/নরাসঃ, নরৌ/নরা, নরেণ/নরা, নরৈঃ/নরেভিঃ, নরাণাম্/নরাম্, নরাঃ/নরাসঃ) দেখা যায়। তদ্রূপ বৈদিক ধাতুরূপের ক্ষেত্রেও একই ধাতুর ভিন্ন ভিন্ন রূপ হতে দেখা যায়। যেমন: কৃ-ধাতু – কৃণোতি, করোতি, কর্ষি, ভূ-ধাতু – ভবতি, বিভর্ত্তি ইত্যাদি। এরূপ বিকল্পরূপ বৈদিক ভাষার ব্যাকরণের অন্যান্য ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়] ব্যবহার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উল্লেখ্য পাণিনির পূর্বেও অনেক সংস্কৃত ব্যাকরণবিদের ব্যাকরণগ্রন্থ ছিল। যেমন – মাহেশ ব্যাকরণ, ঐন্দ্র ব্যাকরণ প্রভৃতি। স্বয়ং পাণিনি তাঁর *অষ্টাধ্যায়ী*র বিভিন্ন সূত্রে দশজন পূর্বাচার্যের (কাশ্যপ, শাকটায়ন, সেনক, আপিশলি, স্ফোটায়ন, চাক্রবর্মণ, গালব, ভারদ্বাজ, শাকল্য ও গার্গ্য) নাম উল্লেখ করেছেন (ভট্টাচার্য্য, ২০১১ : ১২)। সূত্রগুলো হলো :

এক. তৃষিমৃষিকৃশেঃ কাশ্যপস্য (পা. ১/২/২৫)।

দুই. লঙঃ শাকটায়নস্যৈব (পা. ৩/৪/১১১)।

তিন. গিরেশ্চ সেনকস্য (পা. ৫/৪/১১২)।

চার. বা সুপ্যাপিশলেঃ (পা. ৬/১/৯২)।

পাঁচ. অবঙ্ স্ফোটায়নস্য (পা. ৬/১/১২৩)।

ছয়. ঈঁ চাক্রবর্মণস্য (পা. ৬/১/১৩০)। [ঁ = প্লুত স্বর নিদের্শক]

সাত. ইকো হ্রস্বো ঽ ঙ্যো গালবস্য (পা. ৬/৩/৬১)। [ঽ = লুপ্ত অ]

আট. ঋতো ভারদ্বাজস্য (পা. ৭/২/৬৩)।

নয়. লোপঃ শাকল্যস্য (পা. ৮/৩/১৯)।

দশ. ওতো গার্গ্যস্য (পা. ৮/৩/২০)।

দুঃখের বিষয় সূত্রে উল্লেখভূত পূর্বাচার্যদের গ্রন্থের অধিকাংশই লুপ্ত। তবে জানা যায় মাহেশাদি ব্যাকরণ আকারে প্রকারে অতি বিশাল ছিল। কথিত আছে :

সমুদ্রবদ্ ব্যাকরণং মহেশ্বরে
তদর্দ্ধকুম্ভোদ্ধরণং বৃহস্পতৌ।
তদ্ভাগভাগাচ্চ শতং পুরন্দরে
কুশাগ্রবিন্দূৎপতিতং হি পাণিনৌ (চক্রবর্তী, ২০০৩ : ১৪) ॥

অর্থাৎ মাহেশ্বর ব্যাকরণ যদি সমুদ্রতুল্য হয়, বৃহস্পতি ব্যাকরণ আধ কলসী জল, ঐন্দ্র ব্যাকরণ তার শতভাগের একভাগ এবং পাণিনির *অষ্টাধ্যায়ী* ব্যাকরণ কুশের ডগায় জলবিন্দু পরিমাণ মাত্র।

অতঃপর পাণিনি বৈদিক ভাষার শব্দরূপ ও ধাতুরূপের একাধিক বিকল্পরূপ সমস্যা এবং উক্ত ভাষার ব্যাকরণের শূন্যতা সমাধানকল্পে তাঁর গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি গ্রন্থটিতে বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষা নিয়ে অত্যন্ত যুক্তি-নির্ভর, সুশৃঙ্খল ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে আলোচনা করেছেন। একারণে তাঁর ব্যাকরণ অন্যান্য ব্যাকরণের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে। অনেক পণ্ডিত মনে করেন এসব কারণে বিদ্বৎসমাজে পাণিনির ব্যাকরণ অসামান্য জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। এই বিখ্যাত গ্রন্থের কথা বলতে গিয়ে সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ড. এস. কে. বেলভালকার মন্তব্য করেছেন : "It stands-and it will always stand as long as Sanskrit continues to be studied-as a monument at once of encyclopedic research and technical perfection (ভট্টাচার্য্য, ২০১১ : ১২)". উল্লেখ্য পরবর্তিসময়ে এ ব্যাকরণ (*অষ্টাধ্যায়ী*) কাত্যায়ন ও পতঞ্জলির হাতে এসে আরো সুসংগঠিত হয়। অর্থাৎ পাণিনি সূত্রের ওপর কাত্যায়নের বার্ত্তিক ও পাণিনি-কাত্যায়নের সূত্র-বার্ত্তিকের ওপর পতঞ্জলির ভাষ্য প্রদানে পাণিনি ব্যাকরণ *অষ্টাধ্যায়ী* আরও পরিপূর্ণ হয়। তাই এই তিন মুনির লিখিত ব্যাকরণ একত্রে 'ত্রিমুনি ব্যাকরণ' বা 'পূর্ণাঙ্গ অষ্টাধ্যায়ী' নামে অভিহিত হয়। ত্রিমুনি-পরবর্তীকালে আরও অসংখ্য পাণিনীয় সংস্করণ অনুসৃত সংস্কৃত ব্যাকরণবিদদের ব্যাকরণগ্রন্থের কথা জানা যায়। তন্মধ্যে ভট্টোজিদীক্ষিতের *বৈয়াকরণ-সিদ্ধান্তকৌমুদী* সংক্ষেপে *সিদ্ধান্তকৌমুদী* (বাদী ও বিবাদীর তর্ক-বিতর্ক থেকে চাঁদের স্নিগ্ধ আলোর মতো যে সহজ-সরল সিদ্ধান্তে আসা যায়, তাই *সিদ্ধান্তকৌমুদ*), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের *সমগ্র ব্যাকরণ-কৌমুদী* (বিভিন্ন ব্যাকরণগ্রন্থের আলোচনার শেষে জ্যোৎস্নার আলোর মতো যে সিদ্ধান্তে আসা যায়, তাই *সমগ্র ব্যাকরণ-কৌমুদী*) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ভট্টোজিদীক্ষিত পাণিনির *অষ্টাধ্যায়ী*-র ৩৯৯৬ বা ৩৯৮৩টি সূত্রের মধ্যে ৩৪০৪ বা ৩৩৯১টি সূত্রকে সংস্কৃত পদসাধন এবং ৫৯২টি সূত্রকে বৈদিক পদসাধন হিসেবে ব্যবহার করে আধুনিককালে বহুল ব্যবহৃত *সিদ্ধান্তকৌমুদী* নামে একটি অপূর্ব সংস্কৃত ব্যাকরণ আমাদের উপহার দিয়েছেন (বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০০৬ : ভূমিকা)। অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর *সমগ্র ব্যাকরণ-কৌমুদী* গ্রন্থটি প্রণয়ন করে সংস্কৃত ভাষাকে সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। এমনকি এই ব্যাকরণগ্রন্থের সাহায্যে আজ আমরা বাংলা ভাষার ব্যাকরণেরও অনেক অনুৎঘাটিত তথ্য-উপাত্ত জানতে পারছি (যথাস্থানে আলোচনা করা হবে)। মূল কথা এসব ব্যাকরণবিদদের ব্যাকরণ আজ আমরা হাতে পেয়ে বৈদিক তথা সংস্কৃত ভাষা সহজ-সরলভাবে পড়তে, লিখতে ও শিখতে পারছি। মূলত সংস্কৃত ব্যাকরণের পাণিনীয় সংস্করণ অর্থাৎ *অষ্টাধ্যায়ী*-র জন্যই আজ আমরা বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভরত, পুরাণসহ সমস্ত বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদি সহজভাবে অধ্যয়ন-অধ্যপনা করতে পারছি এবং অর্থও অনুধাবন করতে পারছি। এমনকি এ সংস্করণের সাহায্যে আমরা বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষার ওপর বিভিন্ন গবেষণাধর্মী কাজ করে ইতিহাসের নতুন নতুন তথ্য-উপাত্ত উদ্‌ঘাটন করে আধুনিক ভাষা, সমাজ, রাষ্ট্রকে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার প্রয়াস পাচ্ছি। একটি কথা না বললেই নয় যে পাণিনীয় সংস্করণ শুধু বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ জানতেই সহায়ক নয়, এর দ্বারা বাংলাসহ আধুনিক বিভিন্ন ভাষার ব্যাকরণের অনুৎঘাটিত অনেক তথ্যও আমরা জানতে পারি। নিচে পাণিনীয় সংস্কৃত ব্যাকরণের ব্যাকরণসম্পর্কিত কয়েকটি প্রধান বিষয় দৃষ্টান্তসহ তুলে ধরা হলো :

## সন্ধি (Euphonic combination)

### সংস্কৃতে সন্ধির স্বরূপ

সংস্কৃতে সম্ পূবর্ক ধা-ধাতুর উত্তর কি প্রত্যয়যোগে 'সন্ধিঃ' [সম্-√ধা + কি = সন্ধি, সন্ধি + সুপ্ = সন্ধিঃ>সন্ধি (বাংলা রূপ) শব্দটি গঠিত হয়েছে [উপসর্গে ঘোঃ কিঃ (পা. ৩/৩/৯২)] (ভট্টাচার্য্য, ২০১২ : ১৮৭)। ধা-ধাতুর অর্থ ধারণ করা, কিন্তু 'সন্ধি' শব্দের অর্থ হলো মিলন, অর্থাৎ পাশাপাশি দুটি ধ্বনির বা বর্ণের একত্রে ধারণ বা মিলন । এর নামান্তর 'সংহিতা'। এক্ষেত্রে সম্ পূর্বক ধা-ধাতু, ক্ত প্রত্যয় ও

স্ত্রিয়াম্ আপ্ যোগে 'সংহিতা' (সম্-√ধা + ক্ত + স্ত্রিয়াম্ আপ = সংহিতা + সুপ্ = সংহিতা>সংহিতা (বাংলা রূপ) শব্দটির উৎপন্ন হয়েছে [নিষ্ঠা (পা. ৩/২/১০২)] (ভট্টাচার্য, ২০১২ : ১৫৭))। তাই অতিশয় নিকটবর্তী পরস্পর দুটি বর্ণের মিলনকে সন্ধি বা সংহিতা বলে [পরঃ সন্নিকর্ষঃ সংহিতা (পা. ১/৪/১০৯)] (ভট্টাচার্য্য, ২০১২ : ৬২)। সংস্কৃতে সন্ধি চার প্রকার। নিচে প্রত্যেক প্রকারের ভেদ ও তাদের দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হলো:

স্বরসন্ধি : নর + অধমঃ (সুপ্) = নরাধমঃ>নর + অধম = নরাধম (বাংলা রূপ) [অ+ অ = আ]

ব্যঞ্জনসন্ধি : যজ্ + নঃ (সুপ্) = যজ্ঞঃ>যজ্ + ন = যজ্ঞ (বাংলা রূপ) [জ্ + ন>ঞ = জ্ঞ]

জগৎ + ঈশঃ (সুপ্) = জগদীশঃ>জগৎ + ঈশ = জগদীশ (বাংলা রূপ)

পরি + ছদঃ (সুপ্) = পরিচ্ছদঃ>পরি + ছদ = পরিচ্ছদ (বাংলা রূপ)

বিসর্গসন্ধি : পুনঃ + আগতঃ (সুপ্) = পুনরাগতঃ>পুনঃ + আগত = পুনরাগত (বাংলা রূপ)

পুরঃ + কারঃ (সুপ্) = পুরস্কারঃ>পুরঃ + কার = পুরস্কার (বাংলা রূপ)

স্বাদি সন্ধি : নরঃ + আগতঃ = নরাগতঃ

নরঃ + বদতি = নরোবদতি

উল্লেখ্য সংস্কৃত স্বাদিসন্ধি মূলত সংস্কৃত বিসর্গসন্ধির অন্তর্গত। বাংলা ভাষায় স্বাদিসন্ধির কোনো প্রয়োগ নেই।

## উপসর্গ (Prepossitional Prefixes)

### সংস্কৃত উপসর্গের স্বরূপ

উপসর্গ হলো শব্দ গঠন ও অর্থান্তরের একটি অন্যতম প্রক্রিয়া। পাণিনি উপসর্গের কোনো সংজ্ঞা প্রদান করেননি, কিন্তু এর ব্যুৎপত্তির মধ্যেই সংজ্ঞাটি নিহিত আছে। 'উপসর্গ' শব্দটির ব্যুৎপত্তি হলো উপ-√সৃজ্ + ঘঞ্ = উপসর্গঃ>উপসর্গ (বাংলা রূপ) [ভাবে (পা.৩/৩/১৮)] (ভট্টাচার্য, ২০১২ : ১৭৪)। সৃজ্-ধাতুর অর্থ সৃষ্টি করা। কিন্তু উপ-পূর্বক সৃজ্-ধাতুর অর্থ ধাতুর বিশেষভাবে অর্থভেদ (অর্থান্তর) সৃষ্টি করা। তাই ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অনুসারে বলা যায় যে 'উপসৃজতি বিবিধান্ অর্থান্ ইতি উপসর্গঃ'। যা বিবিধ অর্থের সৃষ্টি করে তারই নাম উপসর্গ। অন্যভাবে বলা যায়, যেসব অব্যয় ধাতুর অব্যবহিত পূর্বে যুক্ত হয়ে ধাতুর বিভিন্ন অর্থবৈচিত্র্য সৃষ্টি করে, সেসব অব্যয়কে সংস্কৃত ভাষায় উপসর্গ বলে। যেমন – প্র, পরা প্রভৃতি ২০টি উপসর্গ ক্রিয়ার সঙ্গে যোগ হলে তারা উপসর্গ সংজ্ঞা হয় [প্রাদয়ঃ (পা. ১/৪/৫৮), উপসর্গাঃ ক্রিয়াযোগে (পা.১/৪/৫৯), তে প্রাগ্ ধাতোঃ (পা.১/৪/৮০)] (ভট্টাচার্য্য, ২০১২ : ৫৪, ৫৭)।

দৃষ্টান্তস্বরূপ –

[উপসর্গ দ্বারা ধাতুর অর্থান্তর লাভ]

'হৃ'-ধাতু = হরণ বা চুরি করা

কিন্তু, আ-√হৃ + ঘঞ্ = আহার, আহার + সুপ্ = আহারঃ>আহার (খাওয়া) [বাংলা রূপ]

বি-√হৃ + ঘঞ্ = বিহার, বিহার + সুপ্ = বিহারঃ>বিহার (ভ্রমণ করা) [বাংলা রূপ]

উপ-√হৃ + ঘঞ্ = উপহার, উপহার + সুপ্ = উপহারঃ>উপহার (উপঢৌকন) [বাংলা রূপ]

প্র-√হৃ + ঘঞ্ = প্রহার, প্রহার + সুপ্ = প্রহারঃ>প্রহার (আঘাত করা) [বাংলা রূপ]

সম্-√হৃ + ঘঞ্ = সংহার, সংহার + সুপ্ = সংহারঃ>সংহার (হত্যা করা) [বাংলা রূপ]

এখানে আ, বি, উপ, প্র, সম্ প্রভৃতি অব্যয় 'হৃ'-ধাতুর (হরণ বা চুরি করা) পূর্বে যুক্ত হয়ে বিবিধ অর্থের সৃষ্টি করেছে। অতএব এগুলো উপসর্গ। আর বাংলা ভাষায় আহার, বিহার প্রভৃতি শব্দগুলো শুধু সংস্কৃতের বিভক্তি (সুপ্ = ঃ) পরিহার করে সরাসরি প্রবেশ করেছে।

## প্রত্যয় (Suffix)

### সংস্কৃতে প্রত্যয়ের স্বরূপ

সংস্কৃতে প্রতি পূবর্ক ই-ধাতুর উত্তর অল্ (অপ্, অচ্) প্রত্যয়যোগে 'প্রত্যয়ঃ' [প্রতি-√ই + অল্ = প্রত্যয়, প্রত্যয় + সুপ্ = প্রত্যয়ঃ>প্রত্যয় (বাংলা রূপ)] শব্দটি গঠিত হয়েছে [ঋদোরপ্ (পা.) ৩/৩/৫৭], এরচ্ (পা. ৩/৩/৫৬)।] (ভট্টাচার্য, ২০১২ : ১৮১)। ই-ধাতুর অর্থ যাওয়া, কিন্তু 'প্রত্যয়' শব্দের অর্থ হলো ব্যাকরণের ভাষায় প্রকৃতি (ধাতু ও প্রাতিপদিক) অর্থাৎ শব্দ ও ধাতুর পরে যুক্ত বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি। তৈত্তিরীয় সংহিতায় প্রত্যয় সম্পর্কে বলা হয়েছে 'প্রত্যেতি পশ্চাদ্ আগচ্ছতি ইতি প্রত্যয়ঃ'। অর্থাৎ যা পরে যুক্ত হয় তাই প্রত্যয় (জ্যোতিভূষণ চাকী, ২০০১ : ১২২)। আর ব্যাকরণে বলা হয়েছে 'প্রকৃতেঃ পরঃ প্রত্যয়ো বেদিতব্যঃ'। প্রত্যয়ঃ (পা.৩/১/১), পরশ্চ (পা.৩/১/২)। অর্থাৎ যা প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে শব্দের জ্ঞান জন্মায় তাকে প্রত্যয় (Suffix) বলে (ভট্টাচার্য, ২০১২ : ১১২)। যেমন –

কৃৎ-প্রত্যয় : √গম্ + তব্য = গন্তব্য, গন্তব্য + সুপ্ = গন্তব্যঃ (যাওয়া উচিত, যাবে)>গন্তব্য (বাংলা রূপ)

তদ্ধিত-প্রত্যয় : দশরথ + ইঞ্ = দাশরথি, দাশরথি + সুপ্ = দাশরথিঃ (দশরথস্য অপত্যং পুমান্)>দাশরথি

(বাংলা রূপ) [রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন]

এখানে কৃৎ (তব্য), তদ্ধিত (ইঞ্) প্রভৃতি প্রকৃতি (গম্, দশরথ)-র সঙ্গে যুক্ত হয়ে শব্দের জ্ঞান জন্মায়। তাই এগুলো প্রত্যয়। শব্দ গঠনের ওপর ভিত্তি করে সংস্কৃত ব্যাকরণে প্রত্যয় প্রধানত দুই প্রকার। যথা-

এক. কৃৎ

দুই. তদ্ধিত

তবে এর বাইরে আরো তিন প্রকার প্রত্যয় আছে। যথা –

এক. বিভক্তি

দুই. স্ত্রী-প্রত্যয় ও

তিন. ধাত্ববয়ব

বিভক্তি : √ভূ + লট্-তি = ভবতি>হয় (বাংলা রূপ)

স্ত্রী-প্রত্যয় : দেব + স্ত্রিয়াম্ ঙীপ্ = দেবী, দেবী + সুপ্ = দেবী>দেবী (দেবতা) [বাংলা রূপ]

ধাত্ববয়ব : √গম্ + ণিচ্ + লট্-তি = গময়তি (গমন করান)

গন্তুম্ ইচ্ছতি = √গম্ + সন্ + লট্-তি = জিগমিষতি (যেতে চায়)

পুনঃ পুনঃ গচ্ছতি = √গম্ + যঙ্ + লট্-তে = জঙ্গম্যতে (বার বার গমন করে)

এখানে বিভক্তি (তি), স্ত্রী-প্রত্যয় (ঙীপ্) এবং ধাত্ববয়ব (ণিচ্, সন, যঙ্) প্রকৃতি (ভূ, দেব, গম্)-র সঙ্গে যুক্ত হয়ে শব্দের জ্ঞান জন্মায়। তাই এগুলো প্রত্যয়।

প্রত্যয়ের বিভাগটি সারণিতে প্রদর্শন করলে দাঁড়ায় –

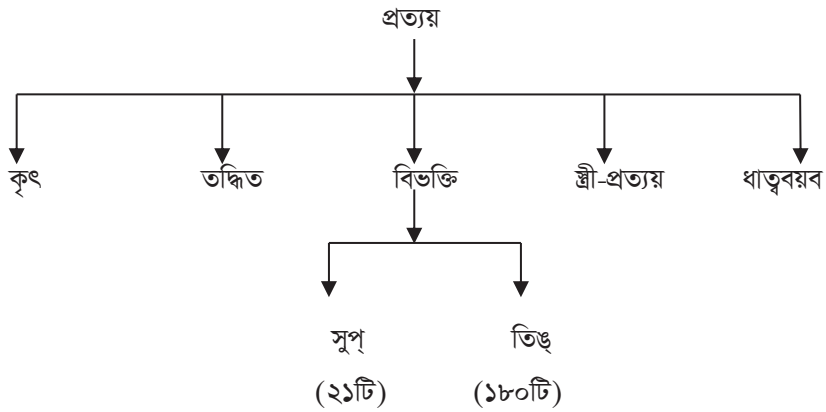


উল্লেখ্য যে, সংস্কৃতে শব্দবিভক্তির অপর নাম সুপ্‌বিভক্তি (সু, ঔ, জস্ প্রভৃতি ২১টি) এবং ক্রিয়াবিভক্তির অপর নাম তিঙ্‌বিভক্তি (তি, তস্, অন্তি প্রভৃতি ১৮০টি)। কিন্তু বাংলায় সুপ্‌বিভক্তি এবং তিঙ্‌বিভক্তি যথাক্রমে শব্দবিভক্তি ও ক্রিয়াবিভক্তি নামে অভিহিত। সেক্ষেত্রে বিভক্তির আকৃতিরও পার্থক্য আছে।

**এক. কৃৎ-প্রত্যয় (Primary Suffixes) :** কৃৎ-এর ব্যুৎপত্তি হলো √কৃ (তুক্ = ৎ আগম) + ক্বিপ্ (সবটাই ইৎ) = কৃৎ [হ্রস্বস্য পিতি কৃতি তুক্' (পা. ৬/১/৭১) সূত্রানুসারে]। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'করে যে'(doer)। যা ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাকে প্রাতিপদিক বা ধাতুতে পরিণত করে, তাই কৃৎ [ধাতুজ-শব্দগঠক অর্থাৎ, কৃৎ-এর 'কৃ' ধাতুই বলছে 'আমি ধাতু থেকে শব্দ গড়ি'] (জ্যোতিভূষণ চাকী, ২০০১ : ১২২)। ধাতোঃ (পা.৩/১/৯১), কৃদতিঙ্ (পা.৩/১/৯৩) [কৃৎ + অতিঙ্ (ন তিঙ্)]। অর্থাৎ ধাতুর উত্তর তিঙ্ প্রত্যয় (তি, তস্, অন্তি প্রভৃতি) ভিন্ন যেসব প্রত্যয় হয়, তাদেরকে কৃৎ-প্রত্যয় বলে (ভট্টাচার্য, ২০১২ : ১২৮)। যেমন–

√গম্ + তব্য = গন্তব্য, গন্তব্য+ সুপ্ = গন্তব্যঃ (যাওয়া উচিত, যাবে)>গন্তব্য (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

এখানে গম্ ধাতুর উত্তর তিঙ্ প্রত্যয় (তি, তস্, অন্তি প্রভৃতি) ভিন্ন 'তব্য' প্রত্যয় হয়েছে। তাই এটি কৃৎ প্রত্যয়।

উল্লেখ্য যে, 'কর্তরি কৃৎ' (পা. ৩/৪/৬৭) সুত্রানুসারে সাধারণত কর্তৃবাচ্যে কৃৎ প্রত্যয় হয়। আর 'তয়োরেব কৃত্যক্তখলর্থাঃ (পা. ৩/১৪/৭০), তব্যত্তব্যানীয়রঃ (পা. ৩/১/৯৬), কেলিমর উপসংখ্যানম্ (বা) সূত্র ও বার্ত্তিক (বা) অনুসারে কর্ম ও ভাববাচ্যে কৃত্য প্রত্যয় অর্থাৎ তব্য, অনীয় প্রভৃতি হয়। স্মর্তব্য যে, বসেস্তব্যৎ কর্তরি ণিচ্চ (বা) অনুসারে কর্তৃবাচ্যে তব্যৎ প্রত্যয় হয়।

**দুই. তদ্ধিত-প্রত্যয় (Secondary Suffixes) :** তদ্ধিতাঃ (পা. ৪/১/৭৬)। তদ্ধিত = তদ্ + হিত, 'তস্মৈ হিতম্' (তার জন্য মঙ্গল)-এর অর্থে যে প্রত্যয় বিহিত তারই সগোত্র প্রত্যয়গুলোকে বোঝায়। পাণিনীয় 'তস্মৈ হিতম্' অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর যেসব প্রত্যয় হয়, তাদের তদ্ধিত প্রত্যয় বলে (ভট্টাচার্য, ২০১২ : ২৩৫)। ব্যুৎপত্তিগত অনুসারে 'তদ্' শব্দটির অর্থ 'তার' এবং হিত' শব্দের অর্থ 'বিহিত'। সুতরাং তার অর্থাৎ শব্দ বা প্রাতিপদিকের উত্তর যে প্রত্যয় বিহিত হয়, তাকে বলা হয় তদ্ধিত প্রত্যয় – 'তেভ্যঃ হিতঃ তদ্ধিতঃ' (ভট্টাচার্য্য, ১৯৯৪ : ভূমিকা)। রূপান্তর – ১: তেভ্যঃ প্রসিদ্ধেভ্যঃ প্রয়োগেভ্যঃ (পদেভ্যো) হিতাঃ প্রত্যয়াঃ তদ্ধিতপ্রত্যয়া তদ্ধিতাঃ। অর্থাৎ শব্দের উত্তর যে সকল প্রত্যয় শিষ্ট প্রয়োগ অনুসারে প্রযুক্ত হয়, তাদেরকে তদ্ধিত প্রত্যয় বলে (সাহা, ১৯৯৭ : ৬৩৯)। রূপান্তর – ২: তেভ্যঃ প্রসিদ্ধেভ্যঃ প্রয়োগেভ্যঃ হিতাঃ প্রত্যয়াঃ তদ্ধিতাঃ। অর্থাৎ শব্দের উত্তর যে সকল প্রসিদ্ধ প্রত্যয় প্রয়োগ হয়, তাদের তদ্ধিত প্রত্যয় বলে (চক্রবর্তী, ২০০৩ : ৫২৬)। অন্যভাবে বলা যায় – যা শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাকে প্রাতিপদিকে পরিণত করে, তাই তদ্ধিত [শব্দজ-শব্দগঠক অর্থাৎ, তদ্ধিত-এর 'তদ্' শব্দই বলছে 'আমি শব্দ থেকে শব্দ গড়ি'] (চাকী, ২০০১ : ১২২)। যেমন –

সর্বজন + খ (ঈন) = সর্বজনীন, সর্বজনীন + সুপ্ = সর্বজনীনঃ>সর্বজনীন (বাংলা রূপ) [সর্বজনেভ্যো হিতঃ]

সর্বজন + খঞ্ = সার্বজনীন, সার্বজনীন + সুপ্ = সার্বজনীনঃ>সার্বজনীন (বাংলা রূপ) [সর্বজনেষু সাধুঃ] ইত্যাদি।

এখানে সর্বজন প্রাতিপদিকের উত্তর খ (ঈন) এবং খঞ প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে। এগুলো তদ্ধিত-প্রত্যয়।

উল্লেখ্য যে, 'সর্বজনীন (সকলের জন্য কল্যাণকর বা মঙ্গলদায়ক)' ও 'সার্বজনীন (সকলের জন্য ভালো)' শব্দ দুটিতে প্রত্যয়ের ভিন্নতার জন্য বানানের পার্থক্য হয়েছে। অর্থাৎ একটিতে বৃদ্ধি-গুণ কিছুই হয়নি। অন্যটিতে বৃদ্ধি-গুণের মধ্যে বৃদ্ধি হয়েছে। তবে মনে রাখতে হবে দুটি বানানই সঠিক। শুধু অর্থে ও ব্যবহারে এদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

তিন. বিভক্তি (বি-√ভজ্ + ক্তি = বিভক্তি Suffixes) : বিভক্তিশ্চ [পা. ১/৪/১০৪]। সংখ্যাকারকবোধয়িত্রী বিভক্তিঃ। যার দ্বারা সংখ্যা ও কারক বোঝায়, তাকে বিভক্তি বলে। অন্যভাবে বলা যায় – ধাতুর উত্তর তিঙ্ (তি, তস্, অন্তি প্রভৃতি) ও প্রাতিপদিকের উত্তর সুপ্ (সু, ঔ, জস্ প্রভৃতি) যে প্রত্যয় যুক্ত হয়, তাকে বিভক্তি বলে (ভট্টাচার্য, ২০১২ : ৬১)। যেমন–

তিঙ্: √ভূ + লট্-তি = ভবতি (হয় বা হচ্ছে)>হয় (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

সুপ্: নর + সু (ঃ) = নরঃ (একজন মানুষ, মানুষটি)>নর (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

এখানে 'ভূ' ধাতুর উত্তর তি এবং 'নর' প্রাতিপদিকের উত্তর সু (ঃ) যুক্ত হয়েছে। এগুলো বিভক্তি।

চার. স্ত্রী-প্রত্যয় (Feminine Suffixes) : স্ত্রিয়াম্ (পা. ৪/১/৩)। স্ত্রীলিঙ্গে শব্দের উত্তর টাপ্, ঈপ্, ঙীপ্, ঙীষ্ (আ, ঈ) প্রভৃতি যে সমস্ত প্রত্যয় হয়, তাদের স্ত্রী-প্রত্যয় বলে (ভট্টাচার্য, ২০১২ : ২২২)। যেমন–

অজ + স্ত্রিয়াম্ টাপ্ = অজা, অজা + সুপ্ = অজা (স্ত্রী ছাগল)>অজা (বাংলা রূপ)

দেব + স্ত্রিয়াম্ ঙীপ্ = দেবী, দেবী + সুপ্ = দেবী (দেবতা)>দেবী (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

এখানে অজ, দেব শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্, ঙীপ্ (আ, ঈ) প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে। এগুলো স্ত্রী-প্রত্যয়।

পাঁচ. ধাত্ববয়ব (ধাতু + অবয়ব = ধাত্ববয়ব Parts of root) : যেসব প্রত্যয় ধাতুর অবয়ব স্বরূপ সেসব প্রত্যয় হচ্ছে ধাত্ববয়ব। অন্যভাবে বলা যায় – ধাতুর উত্তর ণিচ্, সন্, যঙ্ এবং প্রাতিপদিকের উত্তর কাম্য, ক্যচ্ প্রভৃতি যে সমস্ত প্রত্যয় হয়, তাদের ধাত্ববয়ব বলে। যেমন–

ধাতু : √পঠ্ + ণিচ্ + লট্-তি = পাঠয়তি (পড়ানো)

পঠিতুম্ ইচ্ছতি = √পঠ্ + সন্ + লট্-তি = পিপঠিষতি (পড়তে চায়)

পুনঃ পুনঃ পঠতি = √পঠ্ + যঙ্ + লট্-তে = পাপঠ্যতে (বার বার পাঠ করে)

প্রাতিপদিক : আত্মনঃ পুত্রমিচ্ছতি = পুত্র + কাম্য + লট্-তি = পুত্রকাম্যতি (নিজের জন্য পুত্র কামনা করে)

আত্মনঃ পুত্রমিচ্ছতি = পুত্র + ক্যচ্ + লট্-তি = পুত্রীয়তি (নিজের জন্য পুত্র কামনা করে)

এখানে 'পঠ্' ধাতুর উত্তর ণিচ্, সন্, যঙ্ এবং 'পুত্র' প্রাতিপদিকের উত্তর কাম্য, ক্যচ্ প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে। এগুলো ধাত্ববয়ব।

উল্লেখ্য যে, বাংলা ভাষায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে উক্ত প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলো শুধু সংস্কৃতের বিভক্তি পরিহার করে সরাসরি প্রবেশ করেছে।

## কারক (Case)

### সংস্কৃতে কারকের স্বরূপ

পাণিনি তাঁর *অষ্টাধ্যায়ী*-তে কারকের কোনো লক্ষণ প্রদান করেননি। কারণ এর ব্যুৎপত্তির মধ্যেই লক্ষণ বা সংজ্ঞার্থ রয়েছে। কারকে (পা. ১/৪/২৩), ণ্বুল্তৃচৌ (পা. ৩/১/১৩৩), যুবোরনাকৌ (পা. ৭/১/১)। 'কারক' শব্দটি কৃ-ধাতুর উত্তর ণ্বুল্ প্রত্যয় যোগে [করোতি ইতি(যে করে) = √কৃ + ণ্বুল্ = কারক + সুপ্ = কারকঃ>কারক (বাঙলা রূপ)] গঠিত হয়েছে (ভট্টাচার্য, ২০১২ : ৪৭, ১৩৫, ৫৪২)। পাণিনি-পরবর্তী সময়ে অন্য ব্যাকরণে এর লক্ষণে বলা হয়েছে –

ক্রিয়ান্বয়ি কারকম্ (বিদ্যাসাগর, ১৯৯৯ : ৪৯৭)।

অর্থাৎ বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সাথে যার (নামপদ = বিশেষ্য ও সর্বনাম) অন্বয় (সম্বন্ধ) হয়, তাকে কারক বলে। যেমন –

**মানসঃ** পুস্তকং **পঠতি**। (মানস বই পড়ে)

**স** প্রত্যহং বিদ্যালয়ং **গচ্ছতি**। ( সে প্রতিদিন বিদ্যালয়ে যায়)

এখানে ক্রিয়াপদ 'পঠতি (পড়ে)' ও 'গচ্ছতি (যায়)'-র সাথে যথাক্রমে বিশেষ্য 'মানসঃ (মানস)' ও সর্বনাম 'স (সে)'(>তদ্) পদের সম্পর্ক (কর্তৃসম্পর্ক) রয়েছে। অতএব এরা কারক।

### কারকের প্রকারভেদ

ক্রিয়াপদের সাথে নামপদের (বিশেষ্য ও সর্বনাম) সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে কারকের প্রকারভেদ সম্পর্কে বলা হয় –

ষট্ কারকাণি (বিদ্যাসাগর, ১৯৯৯ : ঐ)।

রূপান্তর –

কর্তা কর্ম চ করণং সম্প্রদানং তথৈব চ।

অপাদানাধিকরণমিত্যাহুঃ কারকাণি ষট্ (Bandyopadhyay, ২০০৮ : ৮০) ॥

অর্থাৎ কারক ছয় প্রকার। যথা –

ক. কর্তৃ
খ. কর্ম
গ. করণ
ঘ. সম্প্রদান
ঙ. অপাদান ও
চ. অধিকরণ

কারকের ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদের সাথে দুটি পদের সম্বন্ধ নেই। তাই এরা কারক নয়। যথা –

ক. সম্বন্ধ ও

খ. সম্বোধন

## বিভক্তি (Case & case endings):

### সংস্কৃতে বিভক্তির স্বরূপ

বিভক্তিশ্চ (পা. ১/৪/১০৪)। 'বিভক্তি' শব্দটি বি-পূর্বক ভজ্-ধাতুর উত্তর ক্তি প্রত্যয় যোগে (বি-√ভজ্ + ক্তি = বিভক্তি, Suffix) গঠিত হয়েছে (ভট্টাচার্য, ২০১২ : ৬১)। এর সংজ্ঞায় বলা হয় –

"সংখ্যাকারকবোধয়িত্রী বিভক্তিঃ (বিদ্যাসাগর, ১৯৯৯ : ৪৭৪)।"

রূপান্তর –

বা, "সংখ্যাকারকয়োর্বোধয়িত্রী বিভক্তিঃ (Bandyopadhyay, ২০০৮ : ৮০)।"

বা, "সংখ্যাকারকাদিবোধয়িত্রী বিভক্তিঃ (সাহা, ১৯৯৭ : ৭১/দেবশর্মা, ১৯৫৬ : ২৪)।"

অর্থাৎ যার দ্বারা কোনো শব্দের (প্রাতিপদিকের) সংখ্যা, কারক, সম্বন্ধ প্রভৃতির প্রতীতি জন্মে, তাকে বিভক্তি বলে।

অন্যভাবে বলা যায় –

প্রাতিপদিকের উত্তর সুপ্‌বিভক্তি (সু, ঔ, জস্ প্রভৃতি) [বাংলায় শব্দবিভক্তি : অ, আ, শূন্য প্রভৃতি] ও ধাতুর উত্তর তিঙ্‌বিভক্তি (তি, তস্, অন্তি প্রভৃতি) [বাংলায় ক্রিয়াবিভক্তি : ছি, ছ, ছেন প্রভৃতি] যে প্রত্যয় যুক্ত হয়, তাকে বিভক্তি বলে। যেমন –

সুপ্ : নর + সু (ঃ) = নরঃ (একজন মানুষ)>নর + অ = নর (বাংলা রূপ)

তিঙ্ : √ভূ + লট্-তি = ভবতি (হয়)>হয় (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

### বিভক্তির প্রকারভেদ

সংস্কৃতে শব্দরূপ এবং ধাতুরূপকে লক্ষ করে বিভক্তিকে দুভাগে ভাগ করা হয়। যথা –

১. সুপ্‌বিভক্তি (নামবিভক্তি বা শব্দবিভক্তি) ও

২. তিঙ্‌বিভক্তি (ক্রিয়াবিভক্তি)

বিভক্তির বিভাগটি চিত্রে প্রদর্শন করলে দাঁড়ায় –

বিভক্তি

সুপ্‌বিভক্তি (Nominal ending) — তিঙ্‌বিভক্তি (Verbal ending)

(সুপ্ = ২১টি) — (তিঙ্ = ১৮০টি)

উল্লেখ্য কারকের সাথে সুপ্‌বিভক্তি (নামবিভক্তি)-র সম্পর্ক বলে এখানে কেবল উক্ত বিভক্তির কথাই মনে করতে হবে। সুপ্‌বিভক্তি প্রকারভেদ সম্পর্কে বলা হয় –

বিভক্তয়ঃ সপ্ত (বিদ্যাসাগর, ১৯৯৯ : ৪৭৪)।

অর্থাৎ বিভক্তি সাত প্রকার। যথা –

ক. প্রথমা
খ. দ্বিতীয়া
গ. তৃতীয়া
ঘ. চতুর্থী
ঙ. পঞ্চমী
চ. ষষ্ঠী ও
ছ. সপ্তমী

সংস্কৃতে এক এক বিভক্তির তিন তিন বচন (Number) – একবচন (Singular: এক সংখ্যা বুঝায়), দ্বিবচন (Dual: দুই সংখ্যা বুঝায়), বহুবচন (Plural: তিন বা তদূর্ধ্ব সংখ্যা বুঝায়)। উল্লেখ্য বংলায় এক এক বিভক্তির দুই দুই বচন – একবচন (Singular: এক সংখ্যা বুঝায়), বহুবচন (Plural: তিন বা তদূর্ধ্ব সংখ্যা বুঝায়)।

**সংস্কৃত বিভক্তির বাংলা বিভক্তিতে রূপান্তরের তালিকা**

সচরাচর সংস্কৃতে কোনো বিভক্তি থাকলে বাংলায় রূপান্তর করতে কোন বিভক্তি প্রয়োগ করতে হয়, তার একটি তালিকা নিম্নে তুলে ধরা হলো :

| বিভক্তি | সংস্কৃত বিভক্তি | | | বাংলা বিভক্তি | |
|---|---|---|---|---|---|
| | একবচন | দ্বিবচন | বহুবচন | একবচন | বহুবচন |
| প্রথমা | সু (ঃ) | ঔ | জস্ (অঃ) | শূন্য (০), অ, আ | রা, টি, টা, খানা, খানি, গণ ইত্যাদি। |
| দ্বিতীয়া | অম্ | ঔট্ (ঔ) | শস্ (অঃ) | কে, রে | দিগে, দিগকে, দিগেরে ইত্যাদি। |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| তৃতীয়া | টা (আ) | ভ্যাম্ | ভিস্ (ভিঃ) | দ্বারা, দিয়ে, কর্তৃক, সাথে | দিগের দিয়া, দিগকে দ্বারা, দিক কর্তৃক ইত্যাদি। |
| চতুর্থ | ঙে (এ) | ভ্যাম্ | ভ্যস্ (ভ্যঃ) | কে, রে, জন্য, নিমিত্ত | দিগে, দিগকে, দিগেরে ইত্যাদি। [দ্বিতীয়ার মতো] |
| পঞ্চমী | ঙসি্ (অঃ) | ভ্যাম্ | ভ্যস্ (ভ্যঃ) | হতে, থেকে, চেয়ে | দিগ হতে, দের হতে, দিগের চেয়ে ইত্যাদি। |
| ষষ্ঠী | ঙস্ (অঃ) | ওস্ (ওঃ) | আম্ | র, এর | দিগের, দের ইত্যাদি। |
| সপ্তমী | ঙি (ই) | ওস্ (ওঃ) | সুপ্ | এ, য়, তে, মধ্যে | দিগে, দিগতে ইত্যাদি। |
| সম্বোধন | সু (ঃ) | ঔ | জস্ (অঃ) | হে, ওহে, ভোঃ, অরে, অয়ে ইত্যাদি। | [একবচন ও বহুবচন একই রূপ] |

উল্লেখ্য সংস্কৃতে সম্বোধন বোঝাতে ভোস্ (ভোঃ), হে, অয়ি প্রভৃতি অব্যয় শব্দও ব্যবহৃত হয়।

**প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে একইসাথে সকল কারক-বিভক্তি সম্বন্ধ ও সম্বোধন পদ নির্ধারণ (চক্রবর্তী, ২০০৩ : ১৯৫)**

কারকের সাথে বিভক্তি অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কযুক্ত, কেননা কারক নির্ধারণের সাথে বিভক্তিও নির্ধারণ করা হয়। নিম্নে একটি উপযুক্ত দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে একইসাথে সকল কারক-বিভক্তি নির্ধারণ করা হলো:

ভোঃ রাম! মগধানাং রাজা রাজধান্যাং হস্তেন দরিদ্রেভ্যঃ কোষাৎ বস্ত্রাণি **দদাতি**।
– হে রাম! মগধের রাজা রাজধানীতে কোষ হতে দরিদ্রদেরকে হাত দ্বারা বস্ত্র দেয়।
এখানে –

ক্রিয়াপদ = **দদাতি (দেয়)**

এই ক্রিয়াপদের ওপর প্রশ্ন ছুড়ে দিতে হবে –

| **প্রশ্ন** | **উত্তর** | **কারক ও বিভক্তি** |
|---|---|---|
| ১. কঃ দদাতি? (কে দেয়?) | রাজা (রাজা) | কর্তরি প্রথমা (কর্তায় প্রথমা) |
| ২. কিম্ দদাতি? (কি দেয়?) | বস্ত্রাণি (বস্ত্র) | কর্মণি দ্বিতীয়া (কর্মে দ্বিতীয়া) |
| ৩. কেন দদাতি? (কিসের দ্বারা দেয়?) | হস্তেন (হাত দ্বারা) | করণে তৃতীয়া |
| ৪. কস্মৈ/কেভ্যঃ দদাতি? (কাকে/কাদেরকে দেয়?) | দরিদ্রেভ্যঃ (দরিদ্রদেরকে) | সম্প্রদানে চতুর্থী |
| ৫. কস্মাৎ/কুতঃ দদাতি? (কোথা থেকে দেয়?) | কোষাৎ (কোষ হতে) | অপাদানে পঞ্চমী |

৬. কুত্র দদাতি? (কোথায় দেয়?) রাজধান্যাম্ (রাজধানীতে) অধিকরণে সপ্তমী

উল্লিখিত দৃষ্টান্তে –

| | | |
|---|---|---|
| ১. কস্য? (কার?) | মগধানাম্ (মগধদের) | শেষে ষষ্ঠী (সম্বন্ধে ষষ্ঠী) |
| ২. হে রাম! প্রভৃতি | ভোঃ রাম! (হে রাম!) | সম্বোধনে প্রথমা(সম্বোধনে চ) |

এখানে মগধানাম্ (মগধদের) এবং ভোঃ রাম! (হে রাম!) এদের সঙ্গে বিশেষ্যপদের সম্বন্ধ হয়, কিন্তু **দদাতি (দেয়)** ক্রিয়াপদের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ বা সম্পর্ক নেই। অতএব এরা কোনো কারক নয়। বাংলা ভাষায়ও এভাবে কারক-বিভক্তি নির্ণয় করা হয়।

স্মর্তব্য, সাধারণত কর্তৃকারকে প্রথমা, কর্মকারকে দ্বিতীয়া, করণকারকে তৃতীয়া, সম্প্রদানকারকে চতুর্থী, অপাদানকারকে পঞ্চমী, অধিকরণকারকে সপ্তমী, সম্বন্ধপদে ষষ্ঠী ও সম্বোধনপদে প্রথমা বিভক্তি হয়। তবে, এর ব্যতিক্রমও পরিলক্ষিত হয়। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লেখার অভিপ্রায় রাখছি।

## সমাস (Compound)

### সংস্কৃতে সমাসের স্বরূপ

পাণিনি তাঁর *অষ্টাধ্যায়ী*-তে কারকের মতো সমাসেরও কোনো বিশেষ লক্ষণ প্রদান করেননি। কারণ এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থের মধ্যেই এর সাধারণ বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ভাবে (পা. ৩/৩/১৮)। 'সমাস' শব্দটি সম্ পূর্বক অস্-ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয় যোগে [সম্-√অস্ + ঘঞ্ = সমাস + সুপ্ = সমাসঃ > সমাস (বাঙলা রূপ)] গঠিত হয়েছে (ভট্টাচার্য, ২০১২ : ১৭৪), যার অর্থ পদের সংক্ষেপ বা মিলন। অর্থাৎ দুই বা ততোধিক পদের একপদে সংক্ষিপ্ত হওয়ার নাম সমাস। এজন্য পাণিনি-পরবর্তী সময়ে অন্য ব্যাকরণে এর লক্ষণে বলা হয়েছে –

একপদীভাবঃ সমাসঃ (মুখোপাধ্যায়, ১৯৭৮ : ৩)।

অর্থাৎ দুই বা ততোধিক পদ মিলে যেখানে একটি পদের ভাব সৃষ্টি হয়, তাই সমাস। যেমন –

রাজ্ঞঃ পুরুষঃ = রাজপুরুষঃ (রাজার কর্মচারী)

ত্রয়াণাং মুনীনাং সমাহারঃ = ত্রিমুনি (পাণিনি-কাত্যায়ন-পতঞ্জলি)

এখানে 'রাজ্ঞঃ পুরুষঃ', 'ত্রয়াণাং মুনীনাং সমাহারঃ' একাধিক পদ সংক্ষিপ্ত হয়ে যথাক্রমে রাজপুরুষঃ, ত্রিমুনি গঠিত হয়েছে। অতএব এগুলো সমাস।

### সমাসেরর প্রকারভেদ

প্রাচীনগণ তথা পাণিনির দৃষ্টিতে তথা পদার্থের প্রাধান্যের ভিত্তিতে সমাস চার প্রকার। এ সম্পর্কে আধুনিক ভট্টোজিদীক্ষিত বলেন –

সমাসশ্চতুর্বিধ ইতি প্রায়োবাদঃ।

অব্যয়ীভাবঃ তৎপুরুষঃ বহুব্রীহিঃ দ্বন্দ্বশ্চ (মুখোপাধ্যায়, ১৯৭৮ : ২৮) ॥

রূপান্তর –

সমাসশ্চতুর্বিধ ইতি প্রায়োবাদঃ।

অব্যয়ীভাব-তৎপুরুষ-বহুব্রীহি-দ্বন্দ্বাধিকার-বহির্ভূতানামপি "সহসুপা" ইতি বিধানাৎ (মুখোপাধ্যায়, ১৯৭৮ : ১৭)।

অর্থাৎ প্রাচীনগণের দৃষ্টিতে সমাস প্রায় চার প্রকার – অব্যয়ীভাব, তৎপুরুষ, বহুব্রীহি ও দ্বন্দ্ব। তবে এর বাইরেও এক প্রকার সমাস দেখা যায়। যা সহসুপা নামে অভিহিত।

ক. অব্যয়ীভাব : পূর্বপদার্থপ্রধানো ২ ব্যয়ীভাবঃ (মুখোপাধ্যায়, ১৯৭৮ : ১৭)। [২ = লুপ্ত অ]

অর্থাৎ যে সমাসে পূর্ব পদের অর্থ প্রধান তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে। যেমন –

কূলস্য সমীপম্ = উপকূলম্ (কূলের নিকট)

এখানে উপকূলম্-এর পূর্বপদ উপ (নিকট)-এর অর্থ প্রধান। তাই এটি অব্যয়ীভাব সমাস।

খ. তৎপুরুষ (= কর্মধারয় = দ্বিগু) : উত্তরপদার্থপ্রধানস্তৎপুরুষঃ (মুখোপাধ্যায়, ১৯৭৮ : ঐ)।

অর্থাৎ যে সমাসে পর পদের অর্থ প্রধান তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন –

রাজ্ঞঃ পুরুষঃ = রাজপুরুষঃ (রাজকর্মচারী)

এখানে রাজপুরুষ-এর পরপদ পুরুষ (কর্মচারী)-এর অর্থ প্রধান। তাই এটি তৎপুরুষ সমাস।

তৎপুরুষবিশেষঃ কর্মধারয়ঃ তদ্বিশেষোদ্বিগুঃ (মুখোপাধ্যায়, ১৯৭৮ : ঐ)।

অর্থাৎ কর্মধারয় তৎপুরুষের অন্তর্গত আবার দ্বিগু কর্মধারয়ের অন্তর্গত। যেমন –

[কর্মধারয় = তৎপুরুষ, দ্বিগু = কর্মধারয়; সুতরাং তৎপুরুষ = কমৃধারয় = দ্বিগু]

কর্মধারয় : সিংহ চিহ্নিতম্ আসনম্ = সিংহাসনম্ (রাজাসন)

নীলম্ অম্বরম্ যস্য সঃ = নীলাম্বরম্ (নীল আকাশ, নীলবস্ত্র)

দ্বিগু : চতুর্ণাং যুগানাং সমাহারঃ = চতুর্যুগম্ (সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি)

এখানে কর্মধারয় 'সিংহাসনম্' এবং দ্বিগু 'চতুর্যুগম্' পদদ্বয়ের আসনম্ ও যুগম্ পরপদের অর্থ প্রধান। তাই এরা তৎপুরুষ সমাস।

গ. বহুব্রীহি : অন্যপদার্থপ্রধানো বহুব্রীহিঃ (মুখোপাধ্যায়, ১৯৭৮ : ঐ)।

অর্থাৎ যে সমাসে অন্য পদের অর্থ প্রধান তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন –

দশ আননানি যস্য সঃ = দশাননঃ (রাবণ)

নীলম্ অম্বরম্ যস্য সঃ = নীলাম্বরঃ (শিব)

এখানে দশানন (রাবণ) এবং নীলাম্বর (শিব)-এর অন্য পদের অর্থ প্রধান। তাই এরা বহুব্রীহি সমাস।

ঘ. দ্বন্দ্ব : উভয়পদার্থপ্রধানো দ্বন্দ্বঃ (মুখোপাধ্যায়, ১৯৭৮ : ঐ)।

অর্থাৎ যে সমাসে উভয় পদের (বা একাধিক পদের বা সকল পদের) অর্থ প্রধান তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন –

রামশ্চ লক্ষ্মণশ্চ ভরতশ্চ = রাম-লক্ষ্মণ-ভরতাঃ (রাম, লক্ষ্মণ ও ভরত)

এখানে রাম, লক্ষ্মণ ও ভরত উভয় পদের/একাধিক পদের/সকল পদের অর্থ প্রধান। তাই এটি দ্বন্দ্ব সমাস।

উল্লেখ্য প্রাচীনগণের বিভাগকৃত এই চার প্রকার সমাসের বাইরেও পঞ্চম সমাস ব্যাকরণে দেখা যায়। এজন্য আধুনিক ভট্টোজিদীক্ষিত বলেন –

সমাসশ্চতুর্বিধ ইতি প্রায়োবাদঃ (মুখোপাধ্যায়, ১৯৭৮ : ২৮)।

অর্থাৎ প্রায় চতুর্বিধ এই অর্থেই চতুর্বিধ শব্দটি ব্যাখ্যেয়। ভট্টোজী বলেন এই চার প্রকার বলা হলেও অনেক ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়, এটাই 'প্রায়' শব্দের তাৎপর্য। সেই ব্যতিক্রম দৃষ্টান্তগুলোকে 'সুপ্‌সুপা' সমাস নামে অভিহিত করা হয়, যার ব্যাখ্যা পণিনির নিম্নোক্ত সূত্রের মাধ্যমে কিছুটা করা যায়-

সহ সুপা (পা. ২/১/৪) (ভট্টাচার্য, ২০১২ : ৬৩)।

সুবন্ত পদের সাথে সুবন্ত পদের যে সমাস হয়, তাকে সুপ্‌সুপা বা সহসুপা সমাস বলে। যেমন –

পূর্বং ভূতঃ = ভূতপূর্বঃ (যা পূর্বে হয়েছে)

['ভূতপূর্বে চরট্' (পা. ৫/৩/৩৫) সূত্রানুসারে পূর্বের পদ পরে এবং পরের পদ পূর্বে বসেছে]

এখানে সুবন্ত পদ 'পূর্বম্ (আগে)' ও সুবন্ত পদ 'ভূতঃ (অতীত)' পদের সমাস হয়েছে । তাই এটি সহসুপা সমাস।

উল্লিখিত ত্রুটি নিরসনের জন্য ভট্টোজিদীক্ষিত শব্দের প্রকারের ভিত্তিতে সমাসকে ছয় ভাগে বিভক্ত করেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন –

সুপাং সুপা তিঙা নাম্না ধাতুনাথ তিঙাং তিঙা।

সুবন্তেনেতি বিজ্ঞেয়ঃ সমাসঃ ষড়বিধো বুধৈঃ (মুখোপাধ্যায়, ১৯৭৮ : ১৭) ॥

অর্থাৎ পণ্ডিতমণ্ডলী এটাও বিশেসভাবে জ্ঞাত যে, সুপ্ (সুবন্ত পদ/নামপদ), তিঙ্ (তিঙন্তপদ/ক্রিয়াপদ), নাম (প্রাতিপদিক) ও ধাতু-র সাথে সুবন্ত পদের এবং তিঙ্ ও সুপ্-এর সাথে তিঙন্তপদের ষড়ুবিধ সমাস হয়ে থাকে। যথা –

এক. সুপাং সুপা : সুবন্তের সাথে সুবন্তের যে সমাস, তাই সুপাং সুপা। যেমন –

রাজ্ঞঃ পুরুষঃ = রাজপুরুষঃ (রাজকর্মচারী)

এখানে সুবন্ত 'রাজ্ঞঃ (রাজা>রাজ)' ও সুবন্ত 'পুরুষঃ (কর্মচারী)'-এর সমাস হয়েছে । তাই এটি সুপাং সুপা সমাস।

দুই. সুপাং তিঙা : সুবন্তের সাথে তিঙন্তের যে সমাস, তাই সুপাং তিঙা। যেমন –

পরি অভূষয়ৎ = পর্যভূষয়ৎ (সম্যক অলংকৃত করেছিল) [√ভূষ্ + লঙ্-দ = অভূষয়ৎ]

এখানে সুবন্ত 'পরি (উপসর্গ – সম্যক)' ও তিঙন্ত 'অভূষয়ৎ (অলংকৃত করেছিল)'-এর সমাস হয়েছে । তাই এটি সুপাং তিঙা সমাস।

তিন. সুপাং নাম্না : সুবন্তের সাথে নামের যে সমাস, তাই সুপাং নাম্না। যেমন –

কুম্ভস্য কার/কুম্ভং করোতি যঃ সঃ = কুম্ভকারঃ (কুমার) [√কৃ + অণ্ = কার]

এখানে সুবন্ত 'কুম্ভস্য (কুমারের)' ও নাম 'কার (প্রাতিপদিক)'-এর সমাস হয়েছে । তাই এটি সুপাং নাম্না সমাস।

চার. সুপাং ধাতুনা : সুবন্তের সাথে ধাতুর যে সমাস, তাই সুপাং ধাতুনা। যেমন –

কটং প্রবতে ইতি = কটপ্রঃ (কটকার, মাদুর পস্তুত কারক)[√প্র + লট্-তে = প্রবতে]

এখানে সুবন্ত 'কটং (মাদুর)' ও ধাতু 'প্র (প্রস্তুত করা)'-এর সমাস হয়েছে । তাই এটি সুপাং ধাতুনা সমাস।

পাঁচ. তিঙাং তিঙা : তিঙন্তের সাথে তিঙন্তের যে সমাস, তাই তিঙাং তিঙা। যেমন –

খাদত মোদত ইতি সততম্ অভিধীয়তে যস্যাং ক্রিয়ায়াং সা = কাদতমোদতা (খাও দাও ফুর্তিরত কন্যা]

[√খাদ্ + ক্ত = খাদত, √মুদ্ + ক্ত = মোদত]

এখানে তিঙন্ত 'খাদত (খেয়েছিল)' ও তিঙন্ত 'মোদত (ফুর্তি করেছিল)'-এর সমাস হয়েছে । তাই এটি তিঙাং তিঙা সমাস।

ছয়. তিঙাং সুপা : তিঙন্তের সাথে সুবন্তের যে সমাস, তাই তিঙাং সুপা। যেমন –

কৃন্ত বিচক্ষণ ইতি অভিধীয়তে যস্যাং ক্রিয়ায়াং সা = কৃন্তবিচক্ষণা (প্রত্যুৎপন্নমতি সম্পন্না কন্যা]

[√কৃৎ (কাটা) + লোট্-হি = কৃন্ত (কেটে ফেল), বি -√চক্ষ্ + অন = বিচক্ষণ (ত্রি./বি-ণ চতুর)]

এখানে তিঙন্ত 'কৃন্ত' ও সুবন্ত 'বিচক্ষণ (সুদক্ষ)'-এর সমাস হয়েছে । তাই এটি তিঙাং সুপা সমাস।

উল্লেখ্য উক্ত বিভাগই হলো ভট্টোজীকৃত ষড়ুবিধ সমাসের শ্রেণিবিভাগ। এ বিভাগে সমাসের কোনো নামকরণ নেই। কিরূপ শব্দের সাথে কিরূপ শব্দের সমাস হয় কেবল তারই পরিচয়ক। এ জাতীয় শ্রেণিকরণে কোনো ব্যতিক্রম থাকার সম্ভাবনা নেই।

এভাবে সংস্কৃত ব্যাকরণে পাণিনীয় সংস্করণের সাহায্যে সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণের প্রত্যেকটি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। পাণিনীয় ব্যাকরণের উক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করে বলা যায় যে বাংলা, হিন্দি, প্রাকৃতসহ অনেক ভাষার ব্যাকরণের সন্ধি, প্রত্যয়, উপসর্গ, কারক, সমাস প্রভতি উপাদান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য এসব বিষয়ের সম্যক ধারণা থাকা দরকার। তাই এককথায় বলতে পারি – সংস্কৃত ব্যাকরণে পাণিনীয় সংস্করণ তথা *অষ্টাধ্যায়ী* উক্ত বিষয়াদি জানার একটি অন্যতম আকর গ্রন্থ। উল্লেখ্য মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি পাণিনি ব্যাকরণের সূত্রগুলোকে বেদমন্ত্রের সম মর্যাদা দান করে বলেছেন – "ছন্দোবৎ সূত্রাণি ভবন্তি (ভট্টাচার্য্য, ২০১১ : ১২)।" শুধু তাই নয়, নোয়াম চমস্কির মতো আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীর উদ্ভাবিত ভাষাতত্ত্বের বীজও এই পাণিনি ব্যাকরণে লক্ষ করা যায়। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টি দিয়ে বিচার করলেও তাঁর গ্রন্থকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হয়। তাই পণ্ডিত সত্যস্বরূপ মিশ্র মন্তব্য করেছেন, "Sanskrit laid the foundation of comparative philology as well as of Descriptive Linguistics, the first Descriptive Grammar of a language, being the Sanskrit grammar of Panini (ভট্টাচার্য্য, ২০১১ : ঐ)". সুতরাং বোঝা গেল, পাণিনি ব্যাকরণ বহু গুণে ও বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ। এসব কারণে গ্রন্থটির গুরুত্ব আজও অপরিসীম।

## উপসংহার

পরিশেষে আমরা বলতে পারি সংস্কৃত ব্যাকণের পাণিনীয় সংস্করণ সংস্কৃত ভাষাকে জানার একমাত্র সুসংগঠিত মাধ্যম। এমনকি এ বিজ্ঞানসম্মত ব্যাকরণ স্বমহিমায় সারা দুনিয়ার ভাষাবিদগণের হৃদয়কে জয় করে নিয়েছে। বিশেষ করে ভারতীয় উপমহাদেশের যে-কোনো ভাষার ব্যাকরণের ওপর এর মাতৃত্বের প্রভাব রয়েছে। বাংলা ভাষার ব্যাকরণ সেসবের মধ্যে অন্যতম। পাণিনি সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ জগতের উজ্জ্বল পথপ্রদর্শক। তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণের টেকসই উন্নয়নের জন্য স্বমহিমায় স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তাঁর আলোচনার পথ ধরেই আজ আমরা আধুনিক অনেক ভাষার ব্যাকরণের যথাযথ জ্ঞান আহরণ করতে পেরেছি। এমনকি সংস্কৃত ব্যাকরণের অনেক সূত্র অন্য ভাষার ব্যাকরণে প্রবেশ করে ঐ ভাষার ব্যাকরণসহ শব্দভাণ্ডার তথা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছে। উল্লেখ্য যে, আমরা পাণিনির সূত্রগুলো থেকে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য এবং তৎকালীন সমাজ-সংস্কৃতি-বিষয়ক কথাও জানতে পারি। তাই এসব দিক বিবেচনা করে বলা যায় যে, সংস্কৃত ব্যাকরণে পাণিনীয় সংস্করণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ব্যাকরণের সুশৃঙ্খল ব্যাখ্যার জন্যই *পাণিনীয়শিক্ষা*-য় পাণিনিকে প্রণতি জানানো হয়। আলোচনান্তে সেকথাই পুনরাবৃত্তি করছি –

যেনাক্ষরসমাম্নায়মধিগম্য মহেশ্বরাৎ।
কৃৎস্নং ব্যাকরণং প্রোক্তং তস্মৈ পাণিনয়ে নমঃ (বিদ্যারত্ন, ২০০৩ : ৫) ॥

অর্থাৎ যিনি মহেশ্বরের কাছ থেকে অক্ষরসমাম্নায় (বর্ণমালা) লাভ করে আমাদের নিকট সমগ্র ব্যাকরণশাস্ত্র বর্ণনা করেছেন, সেই পাণিনিকে নমস্কার।

## উল্লেখপঞ্জি


কবিরাজ (২০০৫), শ্রীবিনোদলাল সেন (সম্পা.), *ভট্টোজিদীক্ষিত বিরচিত সিদ্ধান্ত-কৌমুদী*, সদেশ, কলকাতা

চক্রবর্তী, সত্যনারায়ণ, (২০০৩) *পাণিনীয় শব্দশাস্ত্র*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা

চাকী, জ্যোতিভূষণ, (২০০১) *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলিকাতা

দত্ত, রমেশচন্দ্র (২০০০) [শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ভূমিকা সম্বলিত], *ঋগ্বেদ-সংহিতা (দ্বিতীয় খণ্ড)*, *হরফ প্রকাশনী*, কলকাতা

দেবশর্মা, শ্রীহৃষীকেশ (১৯৫৬), *HINTS ON SANSKRIT GRAMMAR AND COMPOSITION*, ব্যারাকপুর, তালপুকুর

বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র (১৯৯৯) (আশুতোষ দেব সম্পাদিত), *সমগ্র ব্যাকরণকৌমুদী*, দেব সাহিত্য কুটির প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅশোককুমার (২০০৬), (সম্পা.), *পাণিনীয় বৈদিক ব্যাকরণ*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা

বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ, (২০০৫), *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তকপর্ষৎ, কলকাতা

বিদ্যারত্ন, শ্রীদেবেন্দ্র কুমার (২০০৩), [সম্পা.], *পাণিনির অষ্ট্যাধ্যায়ী*, সদেশ, কোলকাতা

বেগম ফয়েজুন্নেছা, (১৯৮৪), *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস*, সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ভট্টাচার্য, বিমান, *সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা*, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রা. লি., কলিকাতা

ভট্টাচার্য্য (২০১২), তপনশঙ্কর, (১৯৯৬), [সম্পা.], *মহামুনি পাণিনি প্রণীত অষ্টাধ্যায়ী*। সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা[উল্লেখ্য যে, প্রবন্ধে পাণিনির *অষ্টাধ্যায়ী*-র সমস্ত সূত্র এই সংস্করণ থেকে নেয়া হয়েছে]

ভট্টাচার্য্য, অমিয়কুমার, (২০১১), *সংস্কৃত ব্যাকরণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা

মুখোপাধ্যায়, সচ্চিদানন্দ, (১৯৭৮), *ভট্টোজী দীক্ষিতকৃত বৈয়াকরণ সিদ্ধান্তকৌমুদী (সমাস প্রকরণ)*, সাহিত্য নিকেতন, কলিকাতা

মজুমদার, শ্রীপরেশচন্দ্র, (২০০০), *সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাসার ক্রমবিকাশ*, দে' জ পাবলিশিং, কলকাতা

শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ (১৯৯৯), *বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত*, মাওলা ব্রাদার্স ॥ ঢাকা

সেন, মুরারিমোহন (২০১১) (সম্পা.), *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার* (কালিদাস; কুমারসম্ভব), নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা

সাহা, বিশ্বরূপ (১৯৯৭), *বেদভাষানির্মিতি বা সংস্কৃত ব্যাকরণ*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা

সেন, সুকুমার, (২০১৫) *ভাষার ইতিবৃত্ত*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা

Bandyopadhyay, Ashoke kumor, (2008), *পাণিনীয় HELPS TO THE STUDY OF SANSKRIT GrAMMAR & COMPOSITION*, সদেশ, কলকাতা

Chatterji, Suniti kumar, (1986), *The Origin and Development of the Bengali Language*, Rupa and Co, Calcutta